স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b

বাংলাদেশে গুলেন-বেরি সিনড্রোমের প্রাদুর্ভাব: রোগতত্ত্ব ও চিকিৎসা

জহিরুল ইসলাম ও মোঃ বদরুল ইসলাম, আইসিডিডিআর,বি
কাজী দীন মোহাম্মদ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

কলেজ থেকে বাসায় যাওয়ার রাস্তাটা যেন শেষই হচ্ছিলো না। পা দু'টো বেশ ভারী ভারী লাগছিলো এবং শেষ পর্যন্ত বাসায় পৌঁছতে আরাফাত একদম হাঁপিয়ে উঠলো। বিকেলের মধ্যেই সে বুঝতে পারলো তার পা দু'টো দ্রুত দুর্বল হয়ে আসছে। চুয়াডাঙ্গার এক স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিতে যায় সে। ডাক্তার তাকে ভিটামিন ওষুধ দিলেন আর স্যালাইন খেতে বললেন। আরাফাতের অভিভাবককে এমনও বলা হলো যে, সে হয়তো কোনো মানসিক রোগে ভুগছে। পরদিন আরাফাতের অবস্থার আরো অবনতি হলো। তার হাত দু'টোর শক্তিও কমে আসতে থাকলো। দ্বিতীয়বার ডাক্তারের কাছে গেলেও মানসিক অসুস্থতার কথাই বলা হলো। তৃতীয় দিন যখন আরাফাতের শ্বাসকষ্ট শুরু হলো তখন অভিভাবকরা তাকে ঢাকায় নিয়ে আসলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তাররা বললেন ওর কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজন। অনেক ছোটাছুটির পরও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউ-তে জায়গা পাওয়া গেলো না। অসুস্থতার ছয়দিনের মাথায় ওকে যখন উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউ-তে নিয়ে যাওয়া হলো তখন সে প্রায় অচেতন। শ্বাসপ্রশ্বাস প্রায় নিচ্ছে না বললেই চলে। সঙ্গে সঙ্গে ওকে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। একদিন পর ওর জ্ঞান ফিরলো। ততদিনে ও হাত-পা নাড়ানোর ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছে। চোখের পলক ফেলার, এমনকি পানি পান করার শক্তিটুকুও নেই। টানা ছয়মাস কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যে বাঁচলো আরাফাত। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে ধার-দেনায় জর্জরিত হয়ে আরাফাতের পরিবারকে সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করতে হলো।

জিবিএস-আক্রান্ত একটি শিশু

একসময়ের হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল পরিবারটিতে শোকের ছায়া নেমে এলো। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আরাফাত ভেঙে পড়েনি। ডাক্তার বলেছেন ওর গুলেন-বেরি সিনড্রোম (Guillain–Barré syndrome) বা জিবিএস হয়েছে। দীর্ঘ সময় লাগলেও তা থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরা যায়। এখন সে হুইল চেয়ারে বসতে পারে, একটু-একটু দাঁড়াতেও পারে। সে স্বপ্ন দেখে স্বাভাবিক জীবনের, একটি সুন্দর সাজানো সংসারের।

জিবিএস কী

জিবিএস একধরনের পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিস-জাতীয় অসুখ। বর্তমান বিশ্বে পোলিও কমে যাওয়ার পর এটিই এএফপি বা অ্যাকিউট ফ্লাসিড প্যারালাইসিস হওয়ার প্রধান কারণ। এই অসুখে অতি দ্রুত রোগীর শরীরে শক্তি কমে আসতে থাকে। হাত-পায়ের দুর্বলতার মাত্রা অনুযায়ী রোগীর চলাচলে অসুবিধা থেকে শুরু করে পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসেরও প্রয়োজন হয়। রোগের প্রকোপ শুরুর দিকে ভয়াবহ হলেও যথাযথ চিকিৎসা, নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ)-র সহায়তা এবং পর্যাপ্ত সেবাযত্ন পেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ-রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

জিবিএস হওয়ার কারণ

জিবিএস হওয়ার কারণ ভালোভাবে জানা না-গেলেও কিছুকিছু প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা গেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে অণুজীবের বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য বা মলিকুলার মিমিক্রি-বিষয়ক একটি মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে কিছু বিশেষ ব্যাক্টেরিয়া বা ভাইরাস দ্বারা খাদ্যনালী বা শ্বাসতন্ত্র সংক্রামিত হওয়ার পর শরীরের রোগ-প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি

ভেতরের পাতায়

- তাপপ্রবাহের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যসমস্যা ও পরিত্রাণের উপায়
- শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে উদ্দীপনার ভূমিকা এবং শিশুর যত্ন
- প্রবীণদের স্বাস্থ্যরক্ষায় এগিয়ে আসুন

বর্ষ ২১ | সংখ্যা ১
শ্রাবণ ১৪১৯ | আগস্ট ২০১২
ISSN 1021-2078

icddr,b

আইসিডিডিআর,বি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	আব্বাস ভূঁইয়া
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান ও রুবহানা রকিব

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৯৮৪০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: দেলোয়ার প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ঢাকা

শত্রু চিনতে ভুল করে, কারণ এসব ব্যাক্টেরিয়া বা ভাইরাসের সাথে শরীরের পেশীসঞ্চালক বা অনুভূতি সৃষ্টিকারী স্নায়ুগুলোর বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য রয়েছে। তাই অ্যান্টিবডিগুলো ব্যাক্টেরিয়া বা ভাইরাসকে আক্রমণ করার পাশাপাশি শরীরের পেশীসঞ্চালক বা অনুভূতি সৃষ্টিকারী স্নায়ুগুলোকেও আক্রমণ করে বসে। এর ফলে এই স্নায়ুগুলো তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে এবং প্যারালাইসিস দেখা দেয়, যা এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এসব ছাড়াও কিছু অজানা কারণ রয়েছে যা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন।

বাংলাদেশে বিশেষ করে *ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার জেজুনি* (*C. jejuni*) নামের একধরনের ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণের ফলে জিবিএস-এ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। এছাড়াও আরো কিছু ব্যাক্টেরিয়া বা ভাইরাস দ্বারা ফুসফুস সংক্রামিত হওয়ার পর জিবিএস-এ আক্রান্ত হওয়ার প্রমাণও দেখা গেছে।

জিবিএস-এর লক্ষণ

জিবিএস একধরনের পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিস-জাতীয় অসুখ। এ-রোগের লক্ষণগুলো সাধারণ থেকে ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সামান্য চলাচলের অসুবিধা যা রোগীকে হাসপাতালে আসতে বাধ্য করে না এমন জিবিএস-আক্রান্ত রোগী যেমন আছে, তেমনি মারাত্মক মাংসপেশীর দুর্বলতার কারণে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজন হয় এমন রোগীর সংখ্যাও কম নয়। সাধারণত দ্রুততার সাথে বাড়তে থাকা চার হাত-পায়ের দুর্বলতা নিয়েই রোগীরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। মাঝেমাঝে লক্ষণ হিসেবে হাত-পায়ের শেষ অংশের ব্যথা বা বোধহীনতা দেখা দিতে পারে। অসুখের সবচেয়ে তীব্র পর্যায়ে রোগীর বুকের ও মধ্যচ্ছেদা বা ডায়াফ্রামের মাংশপেশীর প্যারালাইসিসের কারণে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজন হতে পারে, এমনকি মুখের মাংসপেশীর দুর্বলতার ফলে রোগী খাবার খাওয়ার বা পানীয় পান করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। কোনোকিছু খেতে গেলে, এমনকি রোগী তার নিজের লালাও গিলতে গেলে তা ফুসফুসে চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে, যার কারণে কৃত্রিমভাবে টিউবের সাহায্যে রোগীকে খাওয়াতে হয়। এছাড়াও, সিমপ্যাথেটিক বা প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতার অভাবে রক্তচাপের অস্বাভাবিক তারতম্য, অতিরিক্ত ঘামতে-থাকা, অতিরিক্ত লালার নিঃসরণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অস্বাভাবিক নাড়ীর গতি বা হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে-আসার মতো বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। শরীরে ব্যথা এ-রোগের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। অনেক-সময় অসুখের শুরুতেই ব্যথা থাকে আবার দুর্বলতার কিছুদিনের মধ্যেও ব্যথা শুরু হতে পারে। সাধারণত হাত-পায়ের মাংসপেশী, পিঠ, কোমর, ঘাড় বা হাড়ের জোড়ার অংশগুলোতে ব্যথা থাকে।

বাংলাদেশে গুলেন-বেরি সিনড্রোমের ব্যাপ্তি

বাংলাদেশ পোলিও মাইলাইটিস দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে পোলিওতে আক্রান্ত কোনো রোগী সনাক্ত করা যায় নি। ২০০৬ এবং ২০০৭ সালে বাংলাদেশে ১৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের মধ্যে অ্যাকিউট ফ্লাসিড প্যারালাইসিসে আক্রান্ত শিশুর হার ছিলো প্রতি ১০০,০০০ জনে ৩.৫ জন। এদের মধ্যে প্রায় ৫০% রোগীকে জিবিএস-আক্রান্ত হিসেবে সনাক্ত করা হয়। দেশের ছয়টি বিভাগে ১৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের মধ্যে জিবিএস-আক্রান্ত শিশুর হার ছিলো প্রতি ১০০,০০০ জনে ১.৫ থেকে ২.৫ জন। এই হার উত্তরাঞ্চলীয় তিনটি বিভাগ ঢাকা, রাজশাহী ও সিলেটের চেয়ে দক্ষিণাঞ্চলীয় তিনটি বিভাগ

২০১০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০১২ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে জিবিএস রোগীর মাসভিত্তিক বিন্যাস

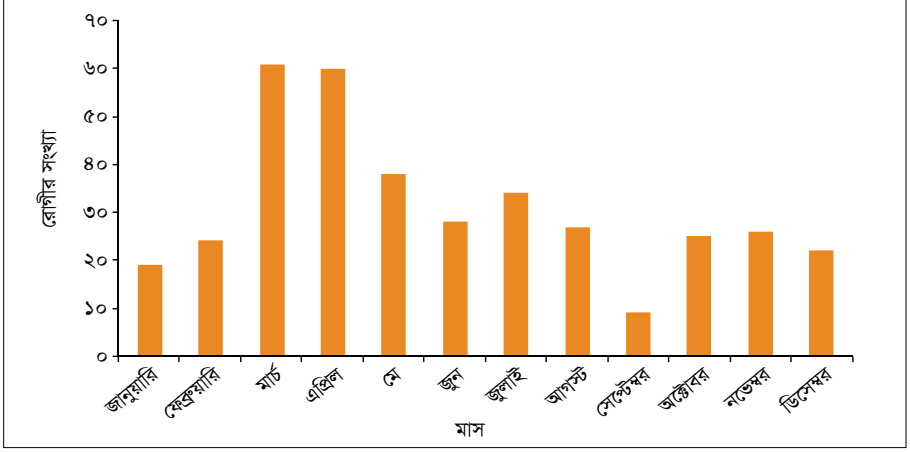

খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রামে বেশি ছিলো। ২০০৬ সাল থেকে এপর্যন্ত আইসিডিডিআর,বি একটি গবেষণা পরিচালনা করছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী যুবকদের মধ্যে জিবিএস-এর হার বেশি। বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় জানুয়ারি এবং মার্চ মাসে বেশি রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। শতকরা ৬৯ জন রোগীর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সংক্রমণের ইতিহাস ছিলো। সবচেয়ে বেশি ছিলো ডায়রিয়ার লক্ষণ (৫০%)। আক্রান্ত রোগীদের অধিকাংশই শুধুমাত্র পেশীসঞ্চালক বা মটর স্নায়ুর দুর্বলতাজনিত অসুস্থতায় ভোগে, কিন্তু এক্ষেত্রে অনুভূতির কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। শতকরা ২৫ জন রোগীর কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের প্রয়োজন হয়েছে। রোগীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ (ফলো-আপ) করে দেখা গেছে, ১৪% রোগী মারা গেছে এবং ২৯% রোগী মারাত্মকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে, প্রায় ৬০% জিবিএস রোগী *C. jejuni* দ্বারা আক্রান্ত ছিলো।

চিকিৎসাকালীন জটিলতা

বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণের প্রবণতা এই রোগের প্রধান চিকিৎসাকালীন সমস্যা। গুলেন-বেরি সিনড্রোমের মারাত্মক পর্যায়ে যখন রোগীর জন্য কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয় অথবা শিরাপথে ওষুধ দেওয়া বা ইউরিনারি ক্যাথেটার পরানোর মতো বিভিন্ন আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় তখন রোগীর শরীরে সংক্রমণের সম্ভাবনা বহুগুণে বেড়ে যায়, যার ফলে রোগী মারাও যেতে পারে। এছাড়াও, স্বয়ংক্রিয় (অটোনমিক) স্নায়ুতন্ত্রের ভারসাম্যহীনতার ফলে রোগীর রক্তচাপ বা নাড়ির গতির অস্বাভাবিক তারতম্য ঘটতে পারে, এমনকি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। বাংলাদেশে পর্যাপ্ত আইসিইউ না-থাকায় অনেক রোগী অপর্যাপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের কারণে ওয়ার্ডেই মারা যায়। রোগের প্রথম একমাসের মধ্যে দুর্বলতার তারতম্য ঘটতে পারে, যা ডিজিজ-রিলেটেড ফ্লাকচুয়েশন নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে রোগীর আপাত উন্নতির পর একমাসের মধ্যে আবার দুর্বলতার অবনতি ঘটতে পারে।

জিবিএস-পরবর্তী অক্ষমতা

রোগের প্রাথমিক ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠলেও রোগী দীর্ঘমেয়াদী নানারকম সমস্যায় ভুগতে পারে। এক্ষেত্রে রোগীর শরীরে থেকে-যাওয়া দুর্বলতার কথা বলা যায়, যা পরবর্তীকালে রোগীকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে দিতে পারে। কোমর থেকে নিম্নাঙ্গের দুর্বলতা রোগীকে শয্যাশায়ী করে ফেলতে পারে। অনেকসময়

চিকিৎসার সাহায্যে একজন জিবিএস-আক্রান্ত রোগী ধীরেধীরে সেরে উঠছেন

'ফুট ড্রপ' নামক পায়ের পাতার দুর্বলতার কারণে রোগীর চলাচলে মারাত্মক অসুবিধা হয়। হাত-পায়ের মাংসপেশী প্রায়ই শুকিয়ে যেতে দেখা যায় এবং তা আগের অবস্থায় ফিরতে অনেক সময় লাগে। অনেক ক্ষেত্রে তা হয়তো কখনোই আগের অবস্থায় ফিরে না। দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা রোগীর সুস্থ হওয়ার পেছনে বড় বাধা হয়ে দেখা দিতে পারে। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রোগী রোগ-পরবর্তী ক্লান্তি বা অবসাদের কথা বলে থাকে। শরীরের সম্পূর্ণ শক্তি ফিরে পাওয়ার পরও রোগী পূর্ণ উদ্যমে কাজ করতে পারে না, বরং অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠে। শুধুমাত্র ব্যায়াম বা ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে এসব সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব।

রোগনির্ণয়

ক্লিনিক্যাল ডায়াগনসিস

রোগীর বিস্তারিত ইতিহাস এবং পূর্বোল্লেখিত লক্ষণসমূহের উপস্থিতি এ-রোগ সনাক্তকরণের জন্য যথেষ্ট।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা

সিএসএফ (স্নায়ুরস বা সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড) পরীক্ষা: রোগীর স্নায়ুরসে স্বাভাবিক মাত্রায় শ্বেত রক্তকণিকা পাওয়া গেলেও বেশিমাত্রায় প্রোটিন পাওয়া যায়। কিছুকিছু ক্ষেত্রে সিএসএফ পুরোপুরি স্বাভাবিক থাকতে পারে।

এনসিএস বা নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি: এই পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগের মূল সমস্যা স্নায়ুর নির্দিষ্ট ধরনের ক্ষতি সনাক্ত করা যায়।

সিএসএফ বা এনসিএস যাই করা হোক না কেন প্রথম সপ্তাহে দু'টি পরীক্ষার ফলাফলই স্বাভাবিক হতে পারে, তাই এগুলো দ্বিতীয় সপ্তাহে করাতে বলা হয়ে থাকে।

চিকিৎসা-ব্যবস্থা

ইন্ট্রাভেনাস ইমিউনোগ্লোবিউলিন এবং প্লাজমাফোরেসিস গুলেন-বেরি সিনড্রোমের দু'টি প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-পদ্ধতি। দূর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, এই চিকিৎসা-ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং বাংলাদেশে শতকরা ৮০ জন জিবিএস-আক্রান্ত রোগীই আর্থিক সঙ্গতির অভাবে এই দুই চিকিৎসা-ব্যবস্থার কোনোটিই গ্রহণ করতে পারে না। এই কারণে এদেশের জিবিএস-আক্রান্ত জনগোষ্ঠির অধিকাংশই সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নিতে পারে না। এর ফলে মৃত্যুহার ও রোগকালীন এবং রোগ-পরবর্তী জটিলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির কথা চিন্তা করে স্বল্প ব্যয়ে একধরনের প্লাজমা এক্সচেইঞ্জ প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের কাজ চলছে।

জিবিএস কি প্রতিরোধ করা যায়?

বিশেষ বিশেষ জীবাণুর সংক্রমণের ফলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়। সঠিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে এসব জীবাণুর সংক্রমণ রোধ করে গুলেন-বেরি সিনড্রোম প্রতিরোধ করা যেতে পারে। ■

তাপপ্রবাহের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যসমস্যা ও পরিত্রাণের উপায়

লায়লা ফারজানা, আইসিডিডিআর,বি

বিশ্বের জলবায়ু ক্রমশই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং মানবদেহের ওপর এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত গবেষণার কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ইন্টার-গভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ (আইপিসিসি) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী রোগের প্রকোপ ও মৃত্যুর হার বাড়বে। ২০০৭ সালে আইপিসিসি কর্তৃক পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্রমাগত তাপপ্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানবদেহের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাবে মৃত্যুর হারও বেড়ে চলেছে।

তাপপ্রবাহ কী

সাধারণভাবে তিনদিন বা তার বেশি সময় ধরে দৈনিক তাপমাত্রা যদি ৯০° ফারেনহাইট (৩২.২° সেলসিয়াস) এর বেশি হয় তবে তাকে তাপপ্রবাহ বলা যায়। তবে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে তাপপ্রবাহকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, কারণ আর্দ্রতা, ভৌগলিক অবস্থান এবং কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের সহনশীলতাভেদে তাপপ্রবাহ এবং তার প্রভাবের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে।

বাংলাদেশের জলবায়ু ও তাপপ্রবাহ

বাংলাদেশের আবহাওয়া মূলত উষ্ণ ও আর্দ্র এবং এতে মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত আবহাওয়া বেশ গরম ও আর্দ্র থাকে। ২০০৯ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে ঢাকায় ৩৮.৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিলো, যা ছিলো বিগত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। বর্তমানে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং গবেষণায় দেখা গেছে, গত দুই দশকে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ০.৩° সেলসিয়াস বেড়েছে। গবেষকদের মতে, মাত্র ২° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে তাপপ্রবাহ-সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর সংখ্যা বছরে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াবে।

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৪০° সেলসিয়াসে (১০৪° ফারেনহাইট) উঠতে দেখা গেছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৬° বেশি। ২০০৭ সালে প্রকাশিত একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, মে মাসের শেষ সপ্তাহে তাপপ্রবাহের কারণে দেশে মোট ২৬ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছিলো এবং প্রায় ২০০ জন হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলো। হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আক্রান্তদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষক, যাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে মাঠে কাজ করছিলেন। গবেষকরা মনে করছেন, ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা আরো ০.৪° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে।

কারা ঝুঁকির সম্মুখীন

মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রা সবার জন্যই অস্বস্তিকর। অনেকের জন্য ঝুঁকিবহুল। তবে ঝুঁকির মাত্রা নির্ভর করে বয়স, শারীরিক অবস্থা, পেশার ধরন প্রভৃতির ওপর। তাপপ্রবাহের ফলে বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু, গর্ভবতী মা, শয্যাশায়ী ব্যক্তি, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, মানসিক রোগ বা হাঁপানী প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, অতিরিক্ত স্থূলকায় ব্যক্তি, দিনমজুর বা প্রখর রোদে দীর্ঘসময় কাজ করেন এমন ব্যক্তি, উপকূলীয় এলাকার অধিবাসী এবং দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী খেটে-খাওয়া মানুষের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।

প্রখর রোদে খোলা জায়গায় কাজ করেন এমন দিনমজুরেরা তাপপ্রবাহের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হন

তাপপ্রবাহের ফলে স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট ঝুঁকি

তাপপ্রবাহের কারণে সাধারণত পেশীর সংকোচন, শারীরিক অবসাদ বা ত্বকের ফুসকুড়ির মতো স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাপপ্রবাহের বিরূপ প্রভাব শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা এবং হৃদরোগ থেকে শুরু করে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। নিচে তাপপ্রবাহের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো তুলে ধরা হলো:

সান বার্ন বা রোদে পোড়া

প্রখর সূর্যের নিচে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলে ত্বক পুড়ে গিয়ে কালসিটে পড়া ও ফুলে-যাওয়া এবং জ্বর ও মাথা-ব্যথার মতো বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ত্বকের ফুসকুড়ি ও ঘামাচি

অতিরিক্ত গরম ও আর্দ্রতার কারণে অনেকেরই শরীরে ঘামাচি দেখা দেয়। শরীর ঘামের মাধ্যমে তাপ ঠিকমতো বের করতে না-পারার ফলে ঘামাচি হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির ঘাড়ে, বুকে ও পিঠে ঘামাচি ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে শিশুরাই এই সমস্যায় বেশি ভোগে।

পানিস্বল্পতা

তাপপ্রবাহের মৌসুমে মানুষের শরীরে প্রচুর পানির চাহিদা থাকে। চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান না-করলে শরীরে পানির স্বল্পতা হতে পারে। পানিস্বল্পতার ফলে বমি-বমি ভাব, অবসাদ বোধ, অস্বস্তি বোধ, পিপাসা, এমনকি খাবারে অরুচিও দেখা দিতে পারে।

ডায়রিয়াজাতীয় রোগ

তাপপ্রবাহের মৌসুমে অতিরিক্ত গরমে খাবার সহজেই নষ্ট হয় এবং বিভিন্ন রকমের ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হয়। নষ্ট খাবার খাওয়ার

ফলে ডায়রিয়াজাতীয় রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মাংসপেশীর সংকোচন

গরমে যারা বেশি ঘামে তারাই সাধারণত মাংসপেশীর সংকোচনের শিকার হয়। এর মুল কারণ হলো অতিরিক্ত ঘামের সাথে শরীরের প্রয়োজনীয় লবণ ও পানি বের হয়ে যায়, ফলে সংবেদনশীল পেশী, যেমন তলপেট, হাত ও পায়ের পেশী সংকুচিত হয়ে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়।

তাপজনিত অবসাদ

পরপর কয়েকদিন তাপপ্রবাহ থাকলে শরীরে অবসাদ বোধ হতে পারে। অতিরিক্ত গরমে ক্রমাগত ঘামের ফলে শরীর পানিশূন্য হয়ে পড়লে দুর্বলতা, ক্লান্তিবোধ, মাথাব্যথা এবং হজমের সমস্যা দেখা দেয়। অতিরিক্ত অবসাদের ফলে একজন ব্যক্তি জ্ঞানও হারাতে পারে।

হিট স্ট্রোক

সাধারণত অতিরিক্তি গরমের ফলে হিট স্ট্রোক হয়, যা অনেকসময় জীবননাশী হয়ে উঠতে পারে। তাপপ্রবাহের প্রথম দিনগুলিতে হিট স্ট্রোকজাতীয় ঘটনায় অনেক মানুষ মারা যায়। ঘামের মাধ্যমে দেহের তাপ বের হতে না-পেরে দেহের তাপমাত্রা ১০৫° ফারেনহাইট বা তার থেকে বেশি উঠলেই সাধারণত হিট স্ট্রোক হয়। এই অবস্থা কিছু সময় পরপর ১৫-২০ মিনিটের জন্য স্থায়ী হতে পারে। শারীরিক অবসাদের মতো এর লক্ষণগুলো অনেকটা একই রকমের, কিন্তু এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বক শুকনো থাকবে (ঘামবে না), সে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে পারবে না, কখনো কখনো অস্বাভাবিক আচরণও করতে পারে, এমনকি অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

পূর্বপ্রস্তুতি ও সচেতনতার মাধ্যমে তাপপ্রবাহ-সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসমস্যার ঝুঁকি কমানো সম্ভব। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

- প্রতিদিন কমপক্ষে ৮-১২ গ্লাস পানি পান করা
- চা ও কফি যতটা সম্ভব সীমিতভাবে পান করা, বরং তার পরিবর্তে ঠাণ্ডা শরবতজাতীয় পানীয় পান করা
- প্রস্রাব যদি সোনালি বা হালকা খয়েরি রঙের হয়, তবে বুঝে নিতে হবে শরীরে পানিস্বল্পতা রয়েছে
- টিভি ও রেডিওর আবহাওয়া বার্তার প্রতি লক্ষ রাখা
- বাইরে চলাচলের সময় ছাতা বা টুপি ব্যবহার করা
- ত্বকে সানস্ক্রিন বা রোদ থেকে রক্ষা করে থাকে এমন লোশন ব্যবহার করা
- হালকা ও ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করা
- অতিরিক্ত লবণ ও মসলাযুক্ত খাবার পরিহার করা
- তিনদিনের বেশি ফ্রিজে রাখা খাবার না-খাওয়া
- খাদ্যের সাহায্যে বিষক্রিয়া বা ফুড পয়জনিং এড়াতে সরাসরি রোদের আলো থেকে খাবার দূরে রাখা
- জীবাণুর সংক্রমণ রোধে ফ্রিজে খাবার ০-৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে রাখা
- হৃদরোগ ও হাঁপানির ওষুধ সেবন করছেন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে শারীরিক অস্বস্তি দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

জরুরী স্বাস্থ্যসমস্যায় করণীয়

কোনো ব্যক্তি তাপপ্রবাহজনিত স্বাস্থ্যসমস্যায় আক্রান্ত হলে সমস্যার ধরন চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিচে কিছু জরুরী অবস্থার ধরন এবং করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

মাংশপেশীর সংকোচন: তাপপ্রবাহের ফলে সৃষ্ট অসুস্থতার প্রাথমিক পর্যায়ে মাংশপেশীর সংকোচন

হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত একটি শিশুর পরিচর্যা করা হচ্ছে

ঘটতে পারে, যা কখনো কখনো খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়। এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত ঠাণ্ডা পানি অথবা চিনি বা গ্লুকোজমিশ্রিত পানি পান করাতে হবে।

অবসাদ বোধ: অতিরিক্ত গরমে কোনো ব্যক্তি প্রচণ্ড অবসাদ বোধ করলে তাকে ঠাণ্ডা কোনো জায়গায় বসিয়ে বা শুইয়ে দিতে হবে এবং ১৫ মিনিট পরপর ঠাণ্ডা পানি পান করাতে হবে। পরনের কাপড় ঢিলে করে দিয়ে ভেজা নরম কাপড় দিয়ে শরীর মুছে দিতে হবে। তবে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি অচেতন হয়ে যায় তাহলে তাকে সাথেসাথে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

হিট স্ট্রোক: তাপপ্রবাহের কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য-সমস্যার সবচেয়ে গুরুতর অবস্থা হলো হিট স্ট্রোক, যা মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে। হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হাসপাতালে নেওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে ঠাণ্ডা স্থানে শুইয়ে রেখে ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছে দিতে হবে এবং অনবরত বাতাস করতে হবে। হাতের কাছে বরফ বা ঠাণ্ডা ভেজা কাপড় থাকলে তা বগলের নিচে বা ঘাড়ের কাছে দিয়ে রাখলে শরীর দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। আক্রান্ত ব্যক্তি অচেতন হয়ে পড়লে তার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক আছে কি না সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। মনে রাখা দরকার, কোনো অবস্থাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যাসপিরিন বা প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ দেওয়া যাবে না।

যদিও বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান তাপপ্রবাহ নিয়ে এযাবৎ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয় নি, তথ্যভিত্তিক বিভিন্ন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বছর-বছর তাপপ্রবাহের মাত্রা এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত স্বাস্থ্যসমস্যা বেড়েই চলেছে। আইপিসিসি ২০০৭ সালে জলবায়ু-সংক্রান্ত তাদের চতুর্থ বিশ্লেষণের ফলাফলে জানিয়েছে যে, জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে দিনদিন তাপপ্রবাহের হার, মাত্রা এবং স্থিতিকাল বৃদ্ধি পাবে। তাই পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য গণসচেতনতার প্রয়োজন। তাপপ্রবাহজনিত স্বাস্থ্যসমস্যাগুলো আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে, এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। তাপপ্রবাহের মৌসুমে ব্যক্তিগত সচেতনতা অনাকাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসমস্যা থেকে আমাদেরকে দূরে রাখতে পারে। ■

শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে উদ্দীপনার ভূমিকা এবং শিশুর যত্ন

শামিমা সিরাজী, আইসিডিডিআর,বি

প্রতিটি শিশুর মধ্যেই রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। শিশুর সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে তার সুন্দর ভবিষ্যতের পথ সুগম হয়ে ওঠে। সে যাতে সুস্থ-সবলভাবে বেড়ে ওঠে এবং তার পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ ঘটে সেজন্য তার জীবনের প্রথম পাঁচ বছরেই তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। শিশুর জীবনের প্রথম পর্যায়ে শারীরিক বৃদ্ধির জন্য কী কী করা দরকার সেসম্পর্কে আমাদের কম-বেশি ধারণা থাকলেও মানসিক বিকাশের জন্য কী করা দরকার সে-বিষয়ে আমাদের অনেকের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক বিকাশ, অর্থাৎ জ্ঞান, বুদ্ধি ও আবেগ বৃদ্ধির জন্যেও জন্ম থেকে পাঁচবছর পর্যন্ত সময়টি শিশুর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর বিকাশ বলতে কী বুঝায়

একটি শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিভিত্তিক আবেগ এবং আচরণগত ও ভাষাগত ক্ষমতাকে শিশুর বিকাশ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি শিশু কীভাবে চিন্তা করবে, কীভাবে কথা বলবে, অন্যের সাথে কী ধরনের আচরণ করবে, কীভাবে নতুন কিছু জানবে ও সমস্যা সমাধান করতে পারবে তা শিখতে পারে তাকে শিশুর বিকাশ বলা হয়।

উদ্দীপনা বলতে কী বুঝায়

শিশুর বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার শরীর ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য উৎসাহ দেওয়ার নামই হচ্ছে উদ্দীপনা।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে উদ্দীপনার গুরুত্ব

মায়ের গর্ভে থাকার সময় থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত একটি শিশুর শরীর ও মনের যে বিকাশ ঘটে তাকেই বলা হয় 'শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ'। ধীরেধীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ও আকারে বড় হওয়াকে বলে শারীরিক বৃদ্ধি আর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার, ভাষা, চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা এবং ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ধীরেধীরে দক্ষতা অর্জনকে বলা হয় মানসিক বিকাশ। এসময়টি শিশুর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এসময়ে তার সবচেয়ে দ্রুত বিকাশ ঘটে, যেমন:

- জন্মের সময় শিশুর যে ওজন থাকে ছয়মাস বয়সের মধ্যে তা দ্বিগুণ হয় এবং একবছর বয়সের মধ্যে তা তিনগুণ হয়ে যায়।
- শিশু মায়ের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার খেতে শেখে।
- শিশু হামাগুড়ি দেয়, হাঁটতে শেখে এবং একা-একা চলাফেরা করতে শেখে।
- তিন বছর বয়সের মধ্যে মস্তিষ্কের বেশিরভাগ অংশের কোষগুলো বিকাশ লাভ করে এবং এদের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হয়।
- তারা শব্দ করতে, কথা বলতে এবং কথা বুঝতে শেখে।
- তারা অন্যদের সাথে মিশতে শেখে এবং বাইরের পরিবেশে খেলাধুলার সুযোগ তৈরি করে নেয়।

শিশুর মস্তিষ্কের অসংখ্য কোষ প্রতিদিনের নতুন নতুন কাজ শেখার মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে ও বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করে। একেবারে ছোটবেলা থেকেই বিভিন্নভাবে শিশুকে নানা ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো এসময়ে সে যা শেখে এবং যেভাবে শেখে তার ওপরই গড়ে ওঠে তার ভবিষ্যত বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, নৈতিক ও সামাজিক আচরণ। মায়ের গর্ভে থাকার সময় থেকে শুরু করে জন্মের পর প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্কের বৃদ্ধির প্রায় বেশিরভাগই সম্পন্ন হয়ে যায়, তাই শিশুর ভবিষ্যত জীবনকে পরিপূর্ণ ও অর্থবহ করে তোলার জন্যে জন্মের পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুর মন ও স্বাস্থ্যের দিকে অনেক বেশি নজর দেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে, শিশুদের পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ওদের প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার এবং বিভিন্ন কাজ ও খেলাধুলার মাধ্যমে বেশিবেশি উৎসাহ-উদ্দীপনা ।

শিশুদের কাছে মা-বাবার গুরুত্ব

শিশুদের অনুভূতি খুব তীক্ষ্ণ, তারা আদর ও ভালবাসা বুঝে এবং তার বহিঃপ্রকাশ দেখতে চায়। তারা মা-বাবার পছন্দের হতে চায় এবং তাদের কাছে গুরুত্ব পেতে চায়। শিশুরা সাধারণত মা-বাবা দু'জনের সাথেই সময় কাটাতে পছন্দ করে। তারা নিরাপদে থাকতে চায় এবং তাই যাদের ওপর বেশি ভরসা করে তাদেরকে আশেপাশে দেখতে চায়। মা-বাবাকে শিশুদের আবেগে সাড়া দিয়ে তাদের অনুভূতি ও চাওয়া-পাওয়া বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তাদের প্রতি যত্নবান হতে হবে। শিশুকে যতটা সম্ভব তার পছন্দের কাজটি করার সুযোগ করে দিতে হবে। তাদেরকে আদর করে, চুমু দিয়ে বা বুকে জড়িয়ে ধরে অনুভূতি প্রকাশ করতে হবে এবং বুঝতে দিতে হবে যে মা-বাবা তাকে ভালোবাসে এবং তাঁরা তার সবচেয়ে কাছের মানুষ।

এসময়ে শিশুরা মা-বাবাকেই তাদের আদর্শ হিসেবে মনে করে এবং তাঁদেরকেই অনুকরণ করার চেষ্টা করে। শিশুরা মা-বাবাকেই সবচেয়ে ভালোবাসে, তাই তাদের পূর্ণ বিকাশে মা-বাবার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আবেগ ও বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশে সহায়তা

জন্মের পর শিশু প্রথমে তার মা-বাবা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং চারপাশের জিনিসগুলোকে চিনতে শেখে এবং ধীরেধীরে হাসি, কান্না, রাগ, দুঃখ—এই আবেগময় দিকগুলোকে বুঝতে শেখে। সে বুঝতে শেখে কীভাবে অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয় এবং অন্যের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করতে হয়। এসময়ে শিশুর সাথে যে ধরনের আচরণ করা উচিত তা নিম্নরূপ:

- শিশুকে জড়িয়ে ধরে, চুমু দিয়ে, স্পর্শ করে তার প্রতি ভালোবাসা দেখাতে হবে।
- শিশুর মন খারাপ দেখলে তাকে কাছে নিয়ে, আদর দিয়ে মন খারাপের কারণ বুঝে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।
- সবসময় শিশুর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হবে, সহজভাবে কথা বলতে হবে এবং তার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে।
- শিশু যখন কোনোকিছু করতে আগ্রহ দেখায় অথবা কোনো কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করে ফেলে তখন তার প্রশংসা করতে হবে। প্রশংসা তার মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করবে এবং ভবিষ্যতে ভালো কাজ করার মনোভাব গড়ে তুলবে।
- দীর্ঘসময় ধরে শিশুকে একা রেখে কোথাও যাওয়া উচিত নয়। এতে সে ভয় পেতে পারে, যার ফলে সে মানসিক বা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।
- উদ্দীপনার মাধ্যমে দৈনন্দিন কাজগুলোকে শিশুর জন্য আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে, যেন সে একঘেয়েমিতে না-ভোগে। শিশুর জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তাকে মজা করে শেখালে সে তা তাড়াতাড়ি শিখতে পারে এবং মনে রাখতে পারে।
- শিশুদের ভালোমন্দ ও নিরাপত্তার জন্য অনেকসময় কিছুটা শাসনের প্রয়োজন হতে পারে। শিশুকে কোনো কাজ করতে নিষেধ করলে তা আদর করে বুঝিয়ে করতে হবে যেন তার মনে আঘাত না-লাগে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরকে ধৈর্যশীল হতে হবে।

খেলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ

শিশু কানে শুনে, চোখে দেখে, স্পর্শ করে এবং বড়দের অনুকরণ করে বুঝতে পারে কীভাবে কোন কাজ করা যায়। খেলাধুলার মাধ্যমে সঠিকভাবে উদ্দীপনা দিলে শিশু কোনো কাজ করার বা সাধারণ সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা অর্জন করতে পারে। খেলা দু'ধরনের হতে পারে:

খেলনা দিয়ে খেলা

শিশুকে এমন ধরনের খেলনা দিতে হবে যা নাড়ালে বাজে বা শব্দ হয়। এতে শিশু কোনো কাজের উপায় এবং তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাবে, যেমন খালি প্লাস্টিকের বোতলের ভিতরে ছোট ছোট কাঠি ঢুকিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করে শিশুকে নাড়াতে দিলে যে শব্দ হবে তা সে বুঝতে পারবে এবং এই শব্দের ফলে সে আনন্দ পাবে। খেলনাগুলোকে হতে হবে শিশুর জন্য নিরাপদ, সস্তা এবং টেকসই। দেশীয় সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করে সহজে হাতে-বানানো খেলনার সাহায্যেও শিশুকে আকৃষ্ট করা যায় এবং শিশুর মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায়।

খেলনা ছাড়া খেলা

গান বা ছড়ার মাধ্যমে শিশুদের সাথে খেলা করা যায়। হাততালি দিয়ে, দোল দিয়ে বা লুকোচুরি খেলে শিশুদের বিনোদনের ব্যবস্থা করা যায়। শিশুরা ছড়া, সুর ও গান শুনতে পছন্দ করে। সুরের তালে তালে ছড়া শিখলে তারা তা ভালোভাবে মনে রাখতে পারে। শিশুরা গানের বা ছড়ার সাথে অঙ্গভঙ্গি দেখতে পছন্দ করে এবং সেরকম করে অনুকরণ করতে চেষ্টা করে।

কথা বলতে শেখানো

শিশুর সাথে বেশিবেশি কথা বলতে হয়, যা তাকে কথা শিখতে সহায়তা করে। দেখা গেছে, যেসব শিশু বেশি মানুষের মধ্যে থাকে তারা দ্রুত কথা বলতে শেখে। শিশুকে কথা বলতে শেখানোর জন্য এবং কথার মাধমে তার জ্ঞান বাড়ানোর জন্য যা যা করা যেতে পারে তা নিম্নরূপ:

- শিশুরা যেসব শব্দ করে বা কথা বলে তার উত্তরে তার সাথে কথা বলতে হবে এবং শিশুকে কথা বলার জন্য উৎসাহ দিতে হবে।

সাধারণ উপকরণের সাহায্যে ঘরে-তৈরি খেলনা দিয়ে খেলছে কয়েকটি শিশু

- শিশুকে তার আশেপাশে থাকে এমন জিনিসের নাম শেখাতে হবে, যেমন বল, জামা, জুতা, ইত্যাদি। এছাড়া তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নাম শেখানো যায়, যেমন হাত, পা, নাক, চোখ, ইত্যাদি।
- মা যখন ঘরের কোনো কাজে ব্যস্ত থাকবেন তখন তিনি তার কাজ নিয়ে শিশুর সাথে কথা বলবেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: মা যখন রান্না করেন তখন তিনি নানা রকমের জিনিসের নাম সম্পর্কে শিশুকে ধারণা দিতে পারেন, যেমন আলু, পেঁয়াজ, বাটি, চামচ, ইত্যাদি।
- গান বা ছড়ার মাধ্যমে শিশুকে বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে শেখাতে হবে, যেমন "কাঠবিড়ালী কাঠবিড়ালী পেয়ারা তুমি খাও?"—এই ছড়ার মাধ্যমে শিশু পেয়ারা ও কাঠবিড়ালী চিনতে পারে এবং এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে পারে।
- শিশু কী বলতে চায়, কী পছন্দ করে সে-ব্যাপারে মা-বাবাকে মনোযোগ দিতে হবে এবং তাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। শিশুর কথা শুনে তাতে সাড়া দিলে তার মধ্যে আস্থা ও আত্মবিশ্বাস জন্মে।
- শিশুর সাথে গল্প করতে হবে এবং গল্প শুনে তার মনে যেসব প্রশ্ন আসবে সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এতে শিশুর কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

শিশুর সাধারণ নিরাপত্তা ও যত্ন

- মা-বাবা বা ঘরের অন্যদের সবসময় শিশুর প্রতি সজাগ থাকতে হবে যেন সে কোনো আঘাত না-পায়। সে কোনো কারণে অস্বস্তি বোধ করলে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে অবস্থা বুঝে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।
- শিশুর খেলার পরিবেশ নিরাপদ রাখতে হবে। আগুন, পানি, বিদ্যুৎ সংযোগ অথবা গরম কোনো জিনিসের কাছাকাছি শিশুকে যেতে দেওয়া যাবে না। ওষুধ, কেরোসিন, কীটনাশক বা কোনো বিষাক্ত তরল পদার্থ শিশুর নাগালের বাইরে রাখতে হবে। ছুরি, কাঁচি বা বটির মতো বিভিন্ন ধারালো জিনিস সবসময় দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।
- শিশু যেন পড়ে না-যায় সেজন্য তাকে বিছানা বা অন্য কোনো উঁচু স্থানে একা রাখা যাবে না। ঘরের মেঝেতে যেন পানি বা কোনো পিচ্ছিল পদার্থ পড়ে না-থাকে সেদিকে সবসময় লক্ষ রাখতে হবে।

প্রতিটি শিশুর জন্যই একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ দরকার। শিশুর চারপাশে যারা থাকেন এবং যারা শিশুর যত্ন নেন, যেমন মা, বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, শিক্ষক—এদের নিয়েই গড়ে ওঠে শিশুর সামাজিক পরিবেশ, এমনকি বাড়ির কাজের লোকও শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া, তার বস্তুগত পরিবেশ, যেমন বিছানা, ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড়, খেলনা, দোলনা, গাছপালা, ইত্যাদিও তার সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার সাথে সম্পর্কযুক্ত। চারপাশের এই সামাজিক ও বস্তুগত পরিবেশের সাথে প্রতিনিয়ত শিশুর পারস্পরিক ক্রিয়া তার বিকাশের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই, এসব পরিবেশ যাতে শিশুর জন্য নিরাপদ, অনুকূল ও আনন্দদায়ক হয় সে-ব্যাপারে মা-বাবাসহ পরিবারের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। যথাযথ সেবাযত্ন ও সময়োপযোগী উদ্দীপনার মাধ্যমে শিশুদেরকে লালন-পালন করে আমরা গড়ে তুলতে পারি ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময়, আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন জাতি। ■

প্রবীণদের স্বাস্থ্যরক্ষায় এগিয়ে আসুন

কাজী নওশাদ হোসেন, আইসিডিডিআর,বি

প্রতিবছরের মতো এবছরও পালন করা হলো 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস'। এবারের স্লোগানটি ছিলো 'গুড হেলথ অ্যাডস লাইফ টু ইয়ার্স', অর্থাৎ 'সুস্বাস্থ্য জীবনে নতুন বছর যোগ করে'। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সংস্থার জন্মদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাই প্রতিবছর ৭ এপ্রিল 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস' উদযাপন করা হয়।

আমরা জানি, এজিং বা বয়স বৃদ্ধি একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং একটি অনিবার্য সত্য। বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের মাধ্যমে আমাদের গড় আয়ু বেড়েছে, যার ফলে প্রবীণ জনসংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। তথ্যভিত্তিক বিভিন্ন বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সদস্য দেশগুলোর বর্তমান জনসংখ্যার ৮%-এর বয়স ৬০ বছরের বেশি, যা ২০২৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১২%-এ এবং ২০৫০ সালে হবে ২০%-এরও বেশি। তখন বিশ্বের প্রবীণ জনসংখ্যা ২০০ কোটিতে পৌঁছবে অথবা প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের বয়স হবে ৬০ বছরের বেশি এবং এই জনগোষ্ঠীর ৮০%-এরও বেশি বসবাস করবে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলোতে।

বিশ্বব্যাপী প্রবীণ জনগোষ্ঠির একটি বড় অংশ মানবেতর জীবন যাপন করে। তাঁদের অনেকের সন্তান-সন্ততি আলাদাভাবে দেশে অথবা বিদেশে বসবাস করেন এবং বৃদ্ধ মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলে যান, এমনকি তাঁদের মৃত্যুর সময়ও অনেকে কাছে থাকতে পারেন না বা থাকার প্রয়োজন মনে করেন না। চরম অর্থকষ্টে বিনা চিকিৎসায় অনেকে ধুঁকে-ধুঁকে মারা যান। সবচেয়ে করুণ অবস্থার শিকার সেইসব দরিদ্র বয়স্ক ব্যক্তি, যাঁদের সন্তান-সন্ততি বা আপনজন বলতে কেউ নেই। তাঁদের বেশিরভাগই ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নেন এবং শহর বা গ্রামে সবধরনের নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত অবস্থায় কোনোরকমে বেঁচে থাকেন। দু'পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরার শক্তি হারানোর পর বিনা চিকিৎসায় অযত্নে অবহেলায় একদিন চিরনিদ্রায় শায়িত হন। সুবিধাবঞ্চিত এসব প্রবীণদের কথা স্মরণ করে তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবছর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বয়স্ক মানুষের সুস্বাস্থ্যের ওপর এবং সেই আলোকে এবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছে 'এজিং অ্যান্ড হেলথ'।

প্রবীণ জনগোষ্ঠির চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক অর্থনৈতিক অবকাঠামো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মনে করে, প্রবীণ জনগোষ্ঠির সুস্বাস্থ্যের জন্য কম ও মাঝারি-আয়ের দেশগুলোতে গতিশীল ও সময়োপযোগী গবেষণা এবং উপযুক্ত চিকিৎসা সামগ্রীর উন্নয়ন ও দ্রুত বাজারজাতকরণ কার্যকর করা

একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে এক দাদী ও তাঁর নাতনী

প্রয়োজন। অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে প্রবীণদের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক চিকিৎসা ও বিনোদন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত, যাতে তাঁরা সুস্থভাবে তাঁদের জীবন উপভোগ করতে পারেন। বিজ্ঞানপ্রসূত বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি প্রবীণদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং সুস্থ ও স্বাবলম্বী জীবনযাপনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন ধরুন, ৬৯ বছরের এক দাদার কথা। নাম রহমত শেখ। তিনি ঢাকার অধিবাসী। তাঁর তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে দু'জন মালয়েশিয়ায় এবং একজন সৌদি আরবে বসবাস করেন। রহমত শেখ একা থাকেন। তিনি প্রতি বুধবার বাসার কাছে একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার ক্লাস করার জন্য যান। তিন ছেলেমেয়ের সাথে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ খুবই কম হয়। কিন্তু এখন ইন্টারনেট সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করার ফলে তিনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাঁর ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনীদেরকে কম্পিউটারে দেখতে পান ও সরাসরি কথাও বলতে পারেন। তাই বহুদূরে থাকার পরও মনের ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যমে তিনি আগের চেয়ে অনেক ভালো আছেন।

সমাজের প্রবীণ সদস্যরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সহজেই নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন। তাঁরা সরাসরি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে জ্ঞান ও চিকিৎসাবিষয়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে চিকিৎসকদের সাথে তাঁদের যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। একইভাবে, প্রবীণ সমাজ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যোগব্যায়াম, সুষম খাদ্য ও খাদ্যাভাস এবং বিভিন্ন রকমের শরীরচর্চা-সংক্রান্ত সুবিধা ভোগ করতে পারে। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফসল হিসেবে বয়োবৃদ্ধ মানুষজন হঠাৎ পড়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা এড়াতে মোশন এবং ভাইব্রেশন সেন্সর ব্যবহার করে অগ্রিম আভাস পেতে পারেন। বয়সজনিত বধিরতা লাঘব করতে বয়স্ক ব্যক্তিরা হিয়ারিং এইড বা শোনার জন্য সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করে বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রযুক্তির প্রয়োগ হতে হবে সহজ ও স্বল্প মূল্যে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার সাথে সম্পর্কিত প্রযুক্তিসমূহ, যেমন ওষুধ, টিকা এবং রোগনির্ণয়ে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ সহজলভ্য হতে হবে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠি তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমাদের সামাজিক জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা 'ইতিবাচক' গতির সঞ্চার করতে পারেন। আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা পরিচালনায় এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতি সাধনে প্রবীণ সমাজের প্রত্যেক সদস্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং তাঁদের মেধা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাঁদেরকে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রগুলোতে কাজে লাগানো, যা আমাদের ভবিষ্যত জীবনে উত্তরণের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বয়স্ক জনসাধারণ যেন সহজ ও সাবলীলভাবে জীবনযাপন করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী, আর এর মাধ্যমেই এক বলিষ্ঠ ও উন্নত জাতি গঠন করা সম্ভব। ■